জাপানি সিনেমার ত্রিরত্ন

নিবিড় চৌধুরী

আকিরা কুরোসাওয়া

১৯১৬ সালের মে মাসে জাহাজে চড়ে জাপানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ততদিনে নোবেল পুরস্কার তিনি পেয়ে গেছেন। জাপান যাওয়ার পথে বিচিত্র সব বর্ণনা জায়গা করে নিয়েছে তার 'জাপান যাত্রী' বইয়ে। সমুদ্র, প্রকৃতি, নাবিক, ক্যাপ্টেন, কেবিন-বয় থেকে শুরু করে সহযাত্রীদের কেউই বাদ পড়েনি। জীবনের নানা ধরনের দার্শনিক চিন্তাও উদিত হয়েছে সেসব লেখায়। জাপান নিয়ে অনেক অভিজ্ঞতার কথা বললেও তাদের সিনেমা নিয়ে কিছু বলেননি রবিঠাকুর। বলবেন কী করে! তখনো যে চলচ্চিত্র নামক শিল্পটি এখনকার মতো অত মহীরূহ হয়ে উঠেননি! হাঁটিহাঁটি পা পা করে বছর বিশেক বয়স তখন তার। তা-ও পশ্চিমা দুনিয়ায় চলছে। এশিয়াতে সেভাবে পরিচিত হয়নি। জাপান বা ভারতেও চর্চা ছিল না। থিয়েটার-অভিনয়কলা নিয়ে জানলেও রবিঠাকুরও বোধহয় সিনেমা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি। নইলে নিশ্চিত চলচ্চিত্র নিয়েও কোনো বই লিখে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ যে বছর জাপানে যান তার বছর ছয়েক আগে জাপানের শিনাগাওয়া শহরে জন্ম নেন আকিরা কুরোসাওয়া। জাপানের চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছে তো বটে, সারাবিশ্বেও বিস্ময়কর এক নাম কুরোসাওয়া। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যের অহংকার তেমনি জাপানের সিনেমায় কুরোসাওয়া। ৩০টি সিনেমা বানিয়েছেন। বলতে গেলে, সব কটি মাস্টারপিস। সিনেমায় জাপানের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা আর ইতিহাসের কথা বলেছেন কুরোসাওয়া। আর সামুরাইদের গল্প তো আছেই তার বিশ্বনন্দিত দুই সিনেমা রশোমন (১৯৫০) ও সেভেন সামুরাই (১৯৫৪) ছবিতে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আলাদা এক অবস্থান আছে এই দুই ছবি। ইতালির নিওরিয়ালজমের ছাপ পড়েছিল বাংলাতেও। সত্যজিত রায়ের বিখ্যাত পথের পাঁচালী (১৯৫৫) ছবিতে সেটি লক্ষণীয়। সেই সময়ে ছবি বানালেও নতুন এক রিয়ালিজম তৈরি করতে পেরেছিলেন কুরোসাওয়া। যার কারণে তাকে বলা হয় নির্মাতাদের নির্মাতা। অনেক বিখ্যাত পরিচালককে প্রভাবিত করে গেছেন কুরোসাওয়া। সিনেমা জগতের প্রায় সব মর্যাদাকর চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছেন তিনি। তবে পুরস্কার দিয়ে মাপা যাবে না মানুষটিকে। তার সেভেন সামুরাই দেখে ইতালির বিখ্যাত নির্মাতা ফেদেরিকো ফেলিনি বলেছিলেন, 'একজন চলচ্চিত্র স্রষ্টার কেমন হওয়া উচিত, কুরোসাওয়া তার জীবন্ত উদাহরণ।' জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'গডফাদার' নির্মাতা ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলার ভাষায়, 'একটা ব্যাপার অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে কুরোসাওয়াকে। একটি বা দুটি মাস্টারপিস বানাননি তিনি। বানিয়েছেন আটটি মাস্টারপিস!' আরেক বিখ্যাত আমেরিকান নির্মাতা মার্তিন স্করসেজির মন্তব্য, 'সারা দুনিয়ার চিত্র নির্মাতাদের ওপর কুরোসাওয়ার প্রভাব এতই গভীর যে, তার সঙ্গে আর কারও তুলনা চলে না।'

কুরোসাওয়া অমর হয়ে আছেন চলচ্চিত্রের দুনিয়ায়। এন্টারটেইনমেন্ট উইকলি'র নির্বাচিত সর্বকালের সেরা পরিচালকদের তালিকায় চোখ বুলালেই বুঝতে পারবেন কোথায় আছেন এই কিংবদন্তি। এ তালিকায় কুরোসাওয়ার অবস্থান ষষ্ঠ। বিশ্বের সেরা ৫০ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র এশীয়। আর আমেরিকানদের বাইরে তার অবস্থান সবার ওপরে। এই তালিকা (অনলাইন) প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে এপ্রিলে। এর দুই বছর পর ৮৮ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমান এই মহান চলচ্চিত্র নির্মাতা। রশোমন ও সেভেন সামুরাই ছাড়াও কুরোসাওয়ার কালজয়ী অন্য সব ছবি হলো ড্রাংকেন অ্যাঞ্জেল (১৯৪৮), দ্য ইডিয়ট (১৯৫১), ইকিরো (১৯৫২), ইয়োজিম্বো (১৯৬১), দেরসু উজালা (১৯৭৫)। তার রশোমন ১৯৫১ সালের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পেয়েছিল গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার। ১৯৫৪ ও ১৯৫৯ সালের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কার পান কুরোসাওয়া। ১৯৭৬ সালে দারসু উজালা অস্কারে জিতে নেয় সেরা বিদেশি ছবির পুরস্কার। ১৯৮০ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'কাগেমুশা'জেতে পাম ডি'অর। এই ছবির জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে কুরোসাওয়া জেতেন বাফটা পুরস্কার। ১৯৯০ সালে কুরোসাওয়াকে দেওয়া হয় সম্মানসূচক অস্কার।

জাপানের সিনেমার আলোচনা হলেই আসবে আরেক কিংবদন্তি নির্মাতা হায়াও মিয়াজাকির (জন্ম টোকিও, ৫ জানুয়ারি ১৯৪১) নাম। অ্যানিমেশন মুভিকে অনন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি। বলতে গেলে, অ্যানিমেশন সিনেমার আজকের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণও তিনি। মাই নেইবার টোটোরো (১৯৮১), কিকি'স ডেলিভারি সার্ভিস (১৯৮৯), ক্যাসল ইন দ্য স্কাই (১৯৮৬), প্রিন্সেস মনোকে (১৯৯৭), হাউলস মুভিং ক্যাসল (২০০৪), স্প্রিটেড অ্যাওয়ে (২০০১), দ্য বয় অ্যান্ড দ্য হিরো হিরোন

(২০২৩) এর মতো ছবি উপহার দিয়েছেন তিনি। তার ছবি মানে কল্পনার বিশাল এক ক্যানভাস। দেখতে দেখতে আপনিই কবে ছবির চরিত্র হয়ে উঠবেন বুঝতেই পারবেন না। মিয়াজাকির ছবিতে ফুটে উঠেছে জাপানের সংস্কৃতি। ভালো-খারাপের দ্বন্দ্ব, মানুষের প্রতি ভালোবাসা। অ্যানিমেশন হলেও মনে হবে বাস্তব সব চরিত্র দেখছেন পর্দায়। তার ছবির আরেক উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হলো থিম সং। ছবির পরতে পরতে যেন সুর গুঁজে দিয়েছেন তিনি। তার ছবির অধিকাংশ চরিত্র কিশোর কিশোরী। মূলত তাদের উদ্দেশ্য করে বানালেও মিয়াজাকির ছবি হয়ে উঠেছে সবার জন্য। বেশিরভাগ জাপানের গ্রামীণ পটভূমির গল্প, জীবনাচার ও সংগ্রামের দৃশ্যেই এঁকেছেন মিয়াজাকি। একটির সঙ্গে আরেকটি রঙিন ছবি জোড়া দিয়েই যে নির্মাণ করেছেন একেকটি অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র।

তবে মিয়াজাকি ভক্তরা দুঃসংবাদ পেয়েছেন বছর দুয়েক আগে। নিজের শেষ ছবিটি যে তিনি বানিয়ে ফেলেছেন! 'হাউ ডু ইউ লিভ' বা 'দ্য বয় অ্যান্ড দ্য হিরন' তার শেষ সিনেমা। এই সিনেমা দিয়ে প্রায় এক দশক পর চলচ্চিত্রে ফিরেছিলেন তিনি। অ্যানিমেশন মাস্টার এত বছর পরে সিনেমা বানালেও হাউ ডু ইউ লিভের মুক্তি নিয়ে

হায়াও মিয়াজাকি

ইয়াসুজিরো ওজো

খুব বেশি মাতামাতি করেননি। মুক্তি দেন খুব সাধারণভাবে। অবশ্য তাতে কী! মিয়াজাকি ভক্তরা ঠিকই হলে ছুটে আসেন তার শেষ ছবির সাক্ষী হতে।

সিনেমায় অবদানের স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেক। বলতে গেলে চলচ্চিত্র দুনিয়ার মর্যাদাকর সব পুরস্কারেরই স্বাদ পেয়েছেন মিয়াজাকি। তার মধ্যে চারবার মনোনয়ন পেয়ে দুইবার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন তিনি।

এখন যার কথা বলব তিনি জাপানি সিনেমার আরেক কিংবদন্তি ও পুরোধা ইয়াসুজিরো ওজো (১৯০৩-১৯৬০)। তার জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে অদ্ভূত এক মিল। দুটোই ১২ ডিসেম্বর। জন্ম টোকিও সিটিতে। এই শহরের মানুষের দৈনন্দিন ব্যস্ততম জীবন নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত অসাধারণ এক সিনেমা তিনি বানান ১৯৫৩ সালে। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে গেছেন কোন সিনেমার কথা বলছি। টোকিও স্টোরি, যে সিনেমার প্রাসঙ্গিকতা থাকবে সবসময়। আধুনিক সময়ের মানুষের ব্যস্ততা কেমন হলে সন্তান গ্রামে থাকা বাবা-মা'কে সময় দিতে পারে না, যেখানে সময় অর্থ ও সম্পর্কের চেয়েও মূল্যবান; সে জীবনের কথায় বলেছেন ওজো। আজকের প্রযুক্তি ও বড় অর্থনীতির দেশ জাপানের ভবিষ্যত তিনি পঞ্চাশের দশকেই দেখতে পেয়েছিলেন। নাহলে টোকিও স্টোরির মতো সিনেমা বানানো সম্ভব? পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের একটি টোকিও। সেই জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন ওজো। সেটিই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে টোকিও স্টোরি বানাতে। এছাড়া তার অন্য দুই সিনেমা লেট স্প্রিং (১৯৪৯) ও অ্যান অটাম আফটারনুন-ও (১৯৬২) বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

ওজো শুধু জাপানের নয়, বিশ্বের সেরা ও প্রভাবশালী ডিরেক্টরদের একজন। ২০১২ সালে ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রির প্রকাশিত সাইট অ্যান্ড সাউন্ড ম্যাগাজিনের পুলের ভোটে তার টোকিও স্টোরি বিশ্বব্যাপী সমালোচকদের চোখে তৃতীয় সেরা সিনেমা নির্বাচিত হয়েছিল। এই সিনেমার পক্ষে পড়েছিল ৩৫৮ ভোট।

যদি বলা হয় জাপানের তিন সেরা পরিচালকের নাম বলতে, তবে শুরুটা হবে এভাবে কুরোসাওয়া, মিয়াজাকি ও ওজো...। এই ত্রিরত্ন ছাড়াও আরেক ফিল্মমেকারের নাম না বললেই নয়, হিরোশি তেশিগাহারা (১৯২৭-২০০১)। তার রহস্য ঘরানার দুই সিনেমা 'উইমেন ইন দ্য ধুন' ও 'দ্য ফেস অব অ্যানাদার' বেশ প্রশংসিত হয়েছিল ষাটের দশকে। সেই সময় কানেতো শিন্ডোর (১৯১২-২০১২) 'ওনিবাবা' নামে আরেকর রহস্য ঘরানার ছবিও বেশ সাড়া জাগিয়েছিল।

এশিয়ান সিনেমায় অনেক আগেই জাপান নিজেদের জায়গা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। চলচ্চিত্রে তাদের নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়েছে। জাপানের গ্রাম ও শহর উপজীব্য হয়েছে তাদের পরিচালকদের সিনেমায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভয়াবহতাও ফুটিয়ে তুলেছে পর্দায়।